## *সারসংক্ষেপ*

বাংলাদেশের বিশেষ সরকারী অপরাধ-দমনকারী বাহিনী হিসাবে খ্যাত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ১৩ নভেম্বর ২০০৯ এ লুৎফর ও খায়রুল খালাসি নামক দুই ভাইকে গ্রেফতার করে। বন্দী অথবা হেফাজতে থাকাকালীন র‍্যাব এর মানুষ খুন করার দীর্ঘ ইতিহাস থাকার কারণে তাদের পরিবারের সদস্যরা পরের দিন একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে তারা কর্তৃপক্ষকে এটি নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন হাজতে থাকাবস্থায় দুই ভাইকে হত্যা করা না হয়। কিন্তু এর দুই দিন পর, ১৮ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে র‍্যাব ঘোষণা করে যে, সেইদিন সকালে র‍্যাবের একটি টহল দলের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধ বা 'গুলিবিনিময়' এর সময়ে দুই ভাই-ই মারা গেছেন। র‍্যাব এই হত্যার ব্যাপারে কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়নি। পরের দিন উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মৃত্যুর ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করে একটি রুল জারি করলে র‍্যাব প্রধান কার্যালয়ের আইন বিষয়ক কর্মকর্তা কোন ধরনের গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটার কথা অস্বীকার করেন, যা তাদের আগের ঘোষণার বিপরীত ছিল।

৩ মার্চ ২০১১ এ ঘটিত একটি সাম্প্রতিক ঘটনার ক্ষেত্রে রাসেল আহমেদ ভূট্টো রাজধানী ঢাকায় তার এক বন্ধুর দোকান সামলানোর সময়ে সাদাপোশাক পরিহিত র‍্যাব সদস্যরা তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। ভূট্টোর ভগ্নিপতি গোলাম মুস্তাফার বক্তব্য অনুযায়ী, সেনাবাহিনীতে কর্মরত তাদের একজন আত্মীয় র‍্যাব এর সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছিলেন যে, ভূট্টোকে 'গুলিবিনিময়' এর ঘটনায় হত্যা করা হবে না। তবে ১০ মার্চ র‍্যাবের একটি গাড়িতে করে ভূট্টোকে নয়া বাজারের একটি পার্কে নিয়ে আসা হয়, যে এলাকায় তিনি বাস করতেন। তাঁকে পার্কের ভিতরে গুলি করা হয়। গুলিবিনিময়ের ঘটনায় মৃত এক অভিযুক্ত অপরাধীর মরদেহ দেখানোর জন্যে র‍্যাব সাংবাদিকদের ডেকে পাঠিয়েছিল। গোলাম মুস্তাফা হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচকে বলেন, "ওরা ভূট্টোকে নিয়ে এসে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে।"

২০০৯ এর জানুয়ারিতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, 'গুম অথবা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া' এবং নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বিষয়ে এই প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখে। এটি *"বিচারক, জুরি ও হত্যাকারী: বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা"* নামক ২০০৬ এ প্রকাশিত হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ প্রতিবেদনের ওপর আরো বর্ণনা দিয়েছে। এই বাহিনীর শিকার ব্যক্তির সংখ্যা বিস্ময়কর। মার্চ ২০১০ এ র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেছিলেন যে, ২০০৪ সালে র‍্যাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ

পর্যন্ত ৬২২ জন মানুষকে হত্যা করেছেন। অপরদিকে বাংলাদেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এর বক্তব্য অনুযায়ী, সূচনা হওয়ার পর থেকে ২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে র‍্যাব অন্তত ৭৩২ জনকে হত্যা করেছে।

সরকারের ভেতরে থাকা কিছু মানুষ এর সংস্কার ও দায়বদ্ধতার জন্যে অনুরোধ করলেও সরকার অপরাধের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের নিয়মমাফিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার দাবি করেছে যে র‍্যাব সদস্যরা আত্মরক্ষার জন্যে পদক্ষেপ নেয়ায় 'গুলিবিনিময়' এর পরিণামে মৃত্যুর ঘটনাগুলো ঘটেছে। কিন্তু এটি পূর্বের সামরিক বাহিনী সমর্থিত 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকার এবং তার পূর্বসূরী ও র‍্যাব এর প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকারের অধীনে সংঘটিত ঘটনার ব্যাখ্যাগুলোর মত একই রকম অন্তঃসারশূন্য।

২০০৪ সালের মার্চে গঠিত হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। সশস্ত্রবাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) ও পুলিশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনী হিসেবে র‍্যাব এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। র‍্যাব সদস্যদের তাদের মূল সংস্থাগুলো থেকে পাঠানো হয় এবং তারা এই নতুন বিশেষ বাহিনীতে সেবার মেয়াদকাল শেষ করার পর সেখানেই ফিরে যান। এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে এবং কমপক্ষে পুলিশের একজন উপ-মহাপরিদর্শকের পদমর্যাদার কোন ব্যক্তি অথবা সেনাবাহিনী থেকে সমতুল্য পদমর্যাদার কেউ এর নেতৃত্ব দেন। র‍্যাবকে বারোটি ব্যাটালিয়নে গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে পাঁচটি রাজধানী ঢাকায় কাজ করে।[১] এটিকে একটি প্রধান সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং র‍্যাব প্রকৃতপক্ষে সন্দিগ্ধ অপরাধী এবং জঙ্গি ইসলামী বা বামপন্থী দলগুলোর অভিযুক্ত সদস্যদের তাদের টার্গেট বানিয়েছে। র‍্যাবের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে এটিকে "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" সংগ্রামরত বাহিনী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন প্রথম এই বাহিনীটিকে তৈরি করা হয়, তখন তৎকালীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগসহ সমালোচকরা বলেছিলেন যে সরকারের উচিত র‍্যাবের পরিবর্তে আইন প্রয়োগে ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেয়া। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে, র‍্যাব গঠন করা হলে পুলিশের গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং কিছু মানুষ বেসামরিক পুলিশী ব্যবস্থায় সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যবহার করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।[২]

তাঁদের উদ্বিগ্নের কারণ পাওয়া গেছে। প্রায়শই গৎবাঁধা সংবাদ মাধ্যমের বিবৃতিতে র‍্যাব দাবি করে যে, আত্মরক্ষার জন্যে অথবা দুর্বৃত্ত বা তাদের সহযোগীরা র‍্যাবের ওপর গুলি চালানোর পর গুলিবিনিময়ের ঘটনায় ঐ ব্যক্তিরা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। তবে অনেক বছর ধরে হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ ও

---

[১] র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, **http://www.rab.gov.bd/index.php#**

[২] হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ, *"বিচারক, জুরি ও হত্যাকারী: বাংলাদেশের অভিজাত নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা" ডিসেম্বর ২০০৬*, **http://www.hrw.org/en/reports/2006/12/13/judge-jury-and-executioner**

বাংলাদেশী মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তদন্তে পাওয়া গেছে যে, র‍্যাবের হেফাজতে থাকাকালীন অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত ব্যক্তিদের শরীরে প্রায়শই এমন অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়, যা তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল বলে ইঙ্গিত করে। র‍্যাবের হেফাজতে থাকার পর বেঁচে যাওয়া অনেক মানুষ বারবার নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়েছেন।

হেফাজতে থাকা মানুষকে খুন করার ব্যাপারে র‍্যাবের আগ্রহ এতটাই কুখ্যাত যে তাদের হেফাজতে নেয়া অনেক মানুষই মৃত্যু প্রত্যাশা করেন। আগস্ট ২০১০ এ একজন ব্যক্তিকে তাদের হেফাজতে চোখ বেঁধে আটকে রেখে পিটানো হয়। তিনি পরে হিউম্যান রাইট্স ওয়াচকে জানান যে, তিনি তাঁর আটককারীদের একটি গুলিবিনিময়ের ঘটনায় তাকে হত্যা করার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছিলেন। তিনি বলেন, "আমি আমার অন্তিম মুহূর্তের জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম এবং এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। আমি জানি বাংলাদেশে প্রতিদিন অনেকেই এইভাবে মারা যান।"

২০০৪ এ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই র‍্যাব যে দায়মুক্তি পেয়ে আসছিল সেটা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও চলছে। হত্যাকাণ্ডগুলোকে বন্ধ করা এবং দোষী ব্যক্তিদের সাজা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও কখনও কোনও র‍্যাব কর্মকর্তা বা সদস্যকে গুলিবিনিময়ের মাধ্যমে হত্যা করা বা অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অপরাধী প্রমাণিত করা হয়নি।

৬ জানুয়ারি ২০০৯ এ আওয়ামী লীগ সরকার কার্যভার গ্রহন করার পর থেকে প্রায় ২০০ জন মানুষ র‍্যাবের অভিযানে মারা গেছেন। তাঁদের পূর্বসূরী বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনির মত একইভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধিরা র‍্যাব এবং অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা কোনও রূপ অন্যায় সংঘটিত হবার কথা অস্বীকার করেন। তারা এই কল্পকাহিনী আঁকড়ে থাকেন যে, কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নেয়ার ফলে ঐ সকল ব্যক্তি মারা গেছেন। এটি হতাশাজনক কারণ বিরোধীপক্ষে থাকাকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদানকারী সদস্যরা র‍্যাব এবং এর কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

মার্চ ২০০৫ এ আওয়ামী লীগ তার আনুষ্ঠানিক নিউজলেটারে র‍্যাবের সমালোচনা করেছিল। এতে র‍্যাব এবং চিতা ও কোবরা নামক স্বল্পস্থায়ী বিশেষ পুলিশ দল দুটির প্রতি উল্লেখ করে বলা হয়েছিল:

> এই বাহিনীগুলোকে এত বেশি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে যে তারা সাংবিধানিক ব্যবস্থা, মানবাধিকার আইন এবং আদালতের আইনগুলোকেও চূড়ান্ত অমার্যাদা করেছে। তারা প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে মানুষকে ধরছে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করছে এবং এগুলোকে 'গুলিবিনিময়ের পরিণামে মৃত্যু' বলে আড়াল করছে। এর শিকার ব্যক্তিদের বিচার করা হয় না

> কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেয়া হয় না। তাই একটি বহুপ্রচলিত কথা আছে- "একজন মানুষ কীভাবে নিশ্চিত হতে পারে যে তার মৃত্যু অনিবার্য?" এর উত্তর হলো, 'যখন র‍্যাব বা শাসকদলের কোন বিশেষ বাহিনী তাকে ধরে।'[৩]

এই নিউজলেটারে এটিও স্বীকার করা হয় যে, র‍্যাবের অভ্যাসগুলো পুলিশ ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছেঃ

> র‍্যাব এর কর্মকাণ্ড এবং তাদের অব্যাহত দায়মুক্তির কারণে উৎসাহিত হয়ে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীও এখন গুলিবিনিময় আখ্যা দিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করছে। হাতকড়া পরানো মানুষকে তথাকথিত গুলিবিনিময়ের মাধ্যমে হত্যা করার ক্ষেত্রে ঐ বাহিনীগুলোর দ্বারা প্রচারিত গৎবাঁধা বিবৃতিগুলো হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর।[৪]

আওয়ামী লীগ ডিসেম্বর ২০০৮ এর নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারেও এই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল যে, "বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে।"[৫]

ক্ষমতায় নির্বাচিত হওয়ায় পর প্রথম কয়েক মাসে আওয়ামী লীত তার দৃঢ় ভাষা বজায় রেখেছিল। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশ্বজনীন পর্যাবৃত্ত পর্যালোচনায় (ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ) পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও হাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর ব্যাপারে বাংলাদেশের 'শূন্য সহনশীলতা'র নীতি রয়েছে বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "আমরা এই রকম কোনও ঘটনাকে উপেক্ষা করি না এবং দায়ী অফিসারদের বিচার করবো।"[৬] কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৭] ২০০৯ এর প্রথম কয়েক মাসে প্রকৃতই র‍্যাবের দ্বারা সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে গিয়েছিল। কিছু পর্যবেক্ষক এর জন্যে র‍্যাব এর অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণের নীতিকে কৃতিত্ব দেন। র‍্যাব এটা নির্ধারণ করতে চেয়েছিল যে, নতুন সরকার অতীতের

---

[৩] মার্চ ২৮, ২০০৫ তারিখের আওয়ামী লীগ নিউজলেটার, খণ্ড ৪, নং ৩, "বিএনপি-জামাত জোটের সাড়ে তিন বছরের অপশাসন এবং ইসলামী জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের উত্থান", http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=37 (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[৪] একই স্থানে।

[৫] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার ২০০৮", http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=1 (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[৬] ইউএন মানবাধিকার কাউন্সিল, বিশ্বজনীন পর্যাবৃত্ত পর্যালোচনা বিষয়ক কর্ম সমিতির প্রতিবেদন বাংলাদেশ, A/HRC/11/18, ৫ অক্টোবর ২০০৯, অনুচ্ছেদ ৮৭, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/162/52/PDF/G0916252.pdf?OpenElement (৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ এ দেখা)

[৭] "সংসদে এ আসন বিতর্ক: হাসিনা বিরোধী পক্ষের দাবি অস্বীকার করলেন", নিউ এজ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, http://www.newagebd.com/2009/feb/12/front.html#2 (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

নিপীড়নের জন্যে তাদেরকে দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে কিনা কিংবা আমূল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন করবে কিনা।

কিন্তু এরপর থেকে নতুন সরকার অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধির বিষয়ে জনগণের উদ্বেগ এবং বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামী জঙ্গিদের কার্যকলাপের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্যে র‌্যাবকে অপরাধের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুলিশের তুলনায় র‌্যাব অধিক সক্ষম বলে বিবেচনা করে। র‌্যাবের নিপীড়নমূলক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে অনেকেই উদ্বিগ্ন নন; কারণ তাঁরা মনে করেন যে, অপরাধীদের আগ্রাসীভাবে মোকাবিলা করা উচিত। এরই প্রেক্ষিতে মনে হয় সরকার যেন র‌্যাব এর বিরোধীতা করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে ভীত।

মার্চ ২০০৯ এ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচকে বলেছিলেন যে, আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক অতীতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর তদন্ত করার কোনও অভিপ্রায় সরকারের নেই, যদিও অন্যায়কারী ব্যক্তিরা এখনও র‌্যাবের পদে বহাল আছেন এবং সম্ভাবনা আছে যে তাঁরা তাদের বেআইনী পদ্ধতি চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, যদিও তিনি 'গুলিবিনিময়ের' ঘটনায় হত্যাকে উপেক্ষা করছেন না, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে র‌্যাব কেবলমাত্র অপরাধীদের হত্যা করেছে।[৮] এক বছর পর ২০১০ এর মে মাসে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের অনেকগুলো প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও আইনমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে, এ ধরনের ঘটনা থেমে গেছে। তিনি বলেন, "দেশে আর কোনও গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটছে না।"[৯]

নিরপরাধ ব্যক্তির আইনগত প্রয়োজনীয় পূর্বধারণার বিষয়ে ভালোভাবে অবগত একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও আইনজীবীর পক্ষে এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর বিবৃতি। এমনকি বিএনপি'র কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে, র‌্যাব অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। আইনমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা নিরন্তর যুক্তি দিয়েছেন যে, নিপীড়নকারীদের সমূলে উপড়ে ফেলার প্রয়োজন ছিল না কারণ তাঁরা র‌্যাব এর ওপর কার্যকরী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন। কিন্তু দুই বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার পরে প্রমাণগুলো তাঁদের এই দাবিকে নস্যাত করেছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যার ক্রমবর্ধমান ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহার খাতুন বলেছিলেন, "অনেক মানুষ কথা বলেছেন এবং এ ব্যাপারে কথা বলবেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি বলছি যে, আইনপ্রয়োগকারীদের কর্তব্য হলো অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা।" নিরন্তর বিচারবহির্ভূত

---

[৮] আইন মন্ত্রী শফিক আহমেদ এর সাথে ঢাকায় হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ এর সাক্ষাৎকার, ১৯ মার্চ ২০০৯

[৯] শফিক কোনও 'গুলিবিনিময়' দেখতে পাচ্ছেন না, **bdnews24.com,** ২৮ মে ২০১০, **http://www.bdnews24.com/details.php?id=162586&cid=2** (১৫ এপ্রিল ২০১০ এ দেখা)।

হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ এর অভিযোগগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "অপরাধীরা যখন র‌্যাব এর ওপর গুলি চালায় তখন আইনপ্রয়োগকারীরা কী করবেন - নিজেদের বাঁচাবেন নাকি মারা যাবেন?"[১০] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটাও অস্বীকার করেন যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে র‌্যাব কোনও বিচারবহির্ভূত হত্যা সংঘটিত করেছে। তিনি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ এ বলেছিলেন যে, "দেশে কোনও গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটছে না। কিন্তু সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা তাদের ওপর গুলি চালানোর পর আত্মরক্ষার্থে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো 'দুষ্কৃতিকারীদের' গুলি করতে বাধ্য হয়েছিলো।"[১১]

নৌপরিহন মন্ত্রী শাহজাহান খান র‌্যাব ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রতি আরও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। ৩ অক্টোবর ২০০৯ এ বিবিসি'র বাংলা বিভাগ আয়োজিত একটি সংলাপে তিনি বলেন, প্রচলিত আইনগুলোর অধীনে অপরাধীদের বিচার করা অসম্ভব এবং গুলিবিনিময়ের ঘটনার মাধ্যমেই একদিন অপরাধের সমাপ্তি ঘটানো যাবে।[১২] এর কয়েকদিন পর সংবাদ মাধ্যমগুলো রিপোর্ট করেছিল যে, নারায়ণগঞ্জে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, গুলিবিনিময়ের মাধ্যমে হত্যার ঘটনাগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় এবং এ ধরনের হত্যাগুলো চাঁদাবাজ ও অন্যান্য অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছে।[১৩] বিস্ময়করভাবে সরকারের অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে কেউই প্রকাশ্যে তাঁর এই মন্তব্যের নিন্দা করেননি।

৫ মে ২০১০ তারিখে *নিউ নেশন* সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, নিজেদের র‌্যাবের সদস্য বলে দাবি করা ব্যক্তিরা সম্প্রতি প্রায় ৫০ জন মানুষকে অপহরণ করে হত্যা করেছে। র‌্যাবের মহাপরিচালকের মতে, এই ঘটনাগুলোতে র‌্যাবের সদস্যরা জড়িত ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে অপরাধীরা র‌্যাব ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ছদ্মবেশ ধারণ করে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে।[14] ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ এ র‌্যাবের নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর মোখলেসুর

---

[১০] "এখনও পর্যন্ত কোনও বিচারবহির্ভূত হত্যা সংঘটিত হয়নি", দ্য ডেইলিস্টার, ২৬ জানুয়ারি ২০১১, **http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=28160** (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[১১] "কোনও গুলিবিনিময় হয়নি", দ্য ডেইলি স্টার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১০, **http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=119471** (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[১২] আইনও সালিশ কেন্দ্র,'গুলিবিনিময়কে' সমাধান হিসাবে প্রশংসা করে দেয়া নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানের মন্তব্যেও বিষয়ে আসকের প্রতিক্রিয়া", **http://www.askbd.org/web/?page_id=835&view=archive&bymonth=10&byyear=2009** (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)। এছাড়াও "সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলা না পর্যন্ত গুলিবিনিময় চলবে", মন্ত্রী, নিউ এজ, ৪ অক্টোবর ২০০৯, **http://www.newagebd.com/2009/oct/04/front.html** (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[১৩] "'গুলিবিনিময়ের' মাধ্যমে হত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়"-মন্ত্রী, দ্য ডেইলি স্টার, ৮ অক্টোবর ২০০৯, **http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=19787** (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[14] মামুনুর রশিদ, "সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অপহণের হারের বিষয়ে সরকার উদ্বিগ্ন: র‌্যাব এর ছদ্মবেশে ৫০ জন নিহত", নিউ নেশন, ৫ মে ২০১০; **http://www.ittefaq.com/issues/2010/05/05/news0195.htm** (৫ মে ২০১০ এ দেখা)।

রহমান ঘোষণা করেন, "র‍্যাব কখনও বিচারবহির্ভূত হত্যাকে সমর্থন করে না। র‍্যাব এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত নয় এবং র‍্যাব মানবাধিকার রক্ষা করে তাদের কর্তব্য পালন করবে।"[১৫]

জ্যেষ্ঠ সরকারী কর্মকর্তারা যদিও জোর দিয়ে বলেছেন যে র‍্যাব এর হাতে মৃত ব্যক্তিরা সবাই অপরাধী ছিলো, তবে কিছু ক্ষেত্রে র‍্যাব ভ্রান্ত পরিচয়ের কারণেও কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ র‍্যাবের হাতে নিহত মহিউদ্দিন আরিফ এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ র‍্যাবের হাতে নিহত কায়সার মাহমুদ বাপ্পি হত্যার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাপের মুখে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই তদন্তগুলো সম্পন্ন করেন। উভয় তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ঐ ব্যক্তিরা র‍্যাবের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।[১৬] কায়সার মাহমুদ বাপ্পির বোন শামসুন্নাহার আলম বলেন, "সাক্ষীরা আমার ভাইকে র‍্যাব কর্মকর্তাদের বলতে শুনেছিলেন, 'দয়া করে আমাকে মারবেন না। আপনারা আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করছেন। আমি ভালো পরিবারের ছেলে', তবুও তারা ওকে গুলি করে।"[১৭] র‍্যাবের কর্মকর্তারা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে একান্তে স্বীকার করেছিলেন যে, বাপ্পির হত্যা ভুলবশত: হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তবুও কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই।[১৮] তদন্ত কমিটিগুলো অন্যায়কারা ব্যক্তিদের সাজা দেয়ার সুপারিশ করলেও কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।[১৯]

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বীকার করেন যে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো এখনও একটি সমস্য হয়ে আছে, যা সরকারী কর্মকর্তারা এতদিন পর্যন্ত অস্বীকার করে আসছিলেন। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা ২০০৪ সালে শুরু হওয়া বিচারবহির্ভূত হত্যাগুলোকে বন্ধ করার জন্যে আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।...... আমি সর্বদাই বিচারবহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে ছিলাম যা দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে চলেছে। এগুলোকে রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব নয়।"[২০] র‍্যাবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সরকারের আগ্রহ বা সামর্থ আছে কিনা, প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে একটি বিষয় নিশ্চিত বলে মনে হয়, র‍্যাব যতদিন দায়মুক্তি পেয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে সক্ষম হবে, তারা ততদিনই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন চালিয়ে যাবে। খালাসি ভাইদের হত্যার মতো

---

[১৫] অধিকার, "মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন", জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১০, ১ অক্টোবর ২০১০, **http://www.odhikar.org/documents/2010/English_Reports/Nine_months_Odhikar_Report_Eng_2010.pdf** (১ এপ্রিল ২০১১ এ দেখা)।

[১৬] বাংলাদেশ ফার্স্ট, "সরকারী তদন্তে প্রমাণ হয়েছে যে বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য র‍্যাব দায়ী - আরিফ মারা গিয়েছিলেন নির্যাতনে, বাপ্পি সরাসরি গুলিতে", ২৪ নভেম্বর ২০১০, **http://www.bangladeshfirst.com/newsdetails.php?cid=2&scid=0&nid=564** (১৫ এপ্রিল ২০১১ এ দেখা)।

[১৭] ঢাকায় শামসুন্নাহার আলমের সাথে হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ এর সাক্ষৎকার, ৪ মার্চ ২০১১

[১৮] ঢাকায় মঞ্জুরুল আলমের সাথে হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ এর সাক্ষৎকার, ৪ মার্চ ২০১১

[১৯] ৭ মার্চ ২০১১ এ ঢাকায় অধিকার এর সাথে এবং ১০ মার্চ ২০১১ এ আসক এর সাথে হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচ এর সাক্ষৎকার

[২০] "আরিয়ল বিল এ বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল", প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, **http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-02-04/news/128857** (১৫ এপ্রিল ২০১১ এ দেখা)। বাংলা থেকে হিউম্যান রাইট্‌স ওয়াচের অনুবাদ।

দৃষ্টিগোচর ঘটনাগুলো থাকা সত্ত্বেও হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ এমন কোনও ঘটনা খুঁজে পায়নি যেখানে বর্তমান সরকার কোনও র‍্যাব কর্মকর্তার দ্বারা মানবাধকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে গুরুতর তদন্ত শুরু করিয়েছে। সরকার ও র‍্যাব কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে দাবি করেছিল যে, অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ বাংলাদেশ সরকারকে এ ধরনের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার বিবরণ দিতে বারবার অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সর্বোচ্চ স্তরের অঙ্গীকার সত্ত্বেও কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, গণমাধ্যম এমনকি শিল্পীরাও বারবার 'গুলিবিনিময়ের' সমস্যার মোকাবিলা না করার বিপদের বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করেছেন। তাঁরা সরকারকে দায়ী ব্যক্তিদের দায়বদ্ধ করতে এবং অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় ও সুরক্ষা দেয়া বন্ধ করতে অনুরোধ করেছেন।

উদ্বেগজনকভাবে র‍্যাব সম্প্রতি বলপূর্বক অন্তর্ধ্যান বা গুম করে দেয়ার ঘটনায় জড়িত হতে শুরু করেছে যা সম্ভবত হত্যায় জড়িত থাকার ঘটনাকে আড়াল করার একটি উপায় হতে পারে। বাংলাদেশী মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে অনেকগুলো নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং র‍্যাব মানুষের মৃত্যুর পিছনে কোনও ভূমিকার কথা স্বীকার না করেই তাদের হত্যা করতে শুরু করেছে।[২১] বাংলাদেশী মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মোহাম্মদ নূর খান লিটন হিউম্যান রাইট্স ওয়াচকে বলেন, "তারা প্রায়ই সাদাপোশাকে মানুষকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যে কোনও দল যে কোনও স্থানে কাজ করতে পারে। কখনও কখনও অন্য কোন জেলায় মরদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। একটি নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছে।"[২২] জুলাই ২০১০ এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানায় যে, তারা এমন অনেক মানুষের নিখোঁজ হওয়ার বিষয় নিয়ে কাজ করছে, যাদের র‍্যাব উঠিয়ে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ আছে।[২৩]

পুলিশ আরও বেশি মাত্রায় র‍্যাবের কয়েকটি বিচারবহির্ভূত কর্মপদ্ধতিকে গ্রহণ করছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশী মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কয়েক শ' হত্যাকাণ্ডের পিছনে পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে দায়ী করা হয়েছে, যা একটি ব্যাপক বৃদ্ধি।[২৪]

---

[২১] ২০১০ এর ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে ঢাকায় মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ এর সাক্ষাৎকার

[২২] হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৯ মার্চ ২০১১

[২৩] জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনী মানুষদের বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ করতে বললো", নিউ এজ, ৭ জুলাই ২০১০, **http://www.newagebd.com/2010/jul/07/front.html** (৯ নভেম্বর ২০১০ এ দেখা)।

[২৪] ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ২০১০ বাংলাদেশের মানবাধিকার সংক্রান্ত অনুশীলন বিষয়ক দেশীয় প্রতিবেদন, **http://paei.state.gov/documents/organization/160056.pdf** (১৫ এপ্রিল ২০১১ এ দেখা)।

বিচার বিভাগ এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে র‍্যাব সদস্যরা আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন, কিন্তু নির্যাতনকারীদের দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁরাও বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেননি। ১৭ নভেম্বর ২০০৯ এ উচ্চ আদালত খালাসি ভাইদের হত্যার বিষয়ে একটি নজিরবিহীন স্বত:প্রণোদিত রায় দেয়। আদালত সরকার ও র‍্যাবকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দেয় যে, অভিযুক্ত র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে কেন যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে না। আদালত বিচারবহির্ভূত হত্যাকে বন্ধ করার আদেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু মামলার শুনানি মুলতবি করা হয়েছিল এবং যে বেঞ্চ এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, মামলার শুনানি করার আগেই সেটিকে পুনর্গঠন করা হয়। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত মামলাটিকে নতুন কোন বেঞ্চের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি এবং শুনানির  জন্যে কোন নতুন তারিখও ধার্য করা হয়নি।

বিদেশী সরকারগুলো, বিশেষত যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার র‍্যাবকে সবচেয়ে কার্যকর সন্ত্রাস-বিরোধী বাহিনী বলে বিবেচনা করে এবং র‍্যাবের সাথে সহযোগিতা বাড়ানোর তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করেছে। র‍্যাবের মানবাধিকার সংক্রান্ত রেকর্ডেও উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে এবং র‍্যাবের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে স্বদেশের সমালোচনাকে দূরে রেখে তারা কিছু র‍্যাব কর্মকর্তাদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তারা এও বলেন যে, তারা অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতার জন্যে একটি কাঠামো স্থাপন করতে র‍্যাবের সঙ্গে কাজ করছেন।[২৫]

অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ইস্যুর ওপর র‍্যাবের সঙ্গে কাজ করতে চায়, কারণ তারা র‍্যাবকে বাংলাদেশের সবচেয়ে পেশাদার ও সক্ষম আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে দেখে। তবে কূটনীতিক ও বিদেশী কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে একমত যে, র‍্যাব সুদূরপ্রাসরী মানবাধিকার লজ্ঘনে যুক্ত আছে। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, তারা সংস্কার সাধনের জন্যে র‍্যাব ও বাংলাদেশী সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করছেন। ফাঁস হওয়া কূটনীতিক কেবলে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে র‍্যাবের বদনামের ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধীনে তারা কেবলমাত্র অংশগ্রহীতাদের সতর্কভাবে খতিয়ে দেখার পরেই মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, যদিও তারা সতর্কভাবে খতিয়ে দেখার পদ্ধতির জন্যে অপ্রতুল সম্পদ নিয়োজিত করে।[২৬]

[২৫] মানবাধিকার ও গণতন্ত্র: ২০১০ ফরেইন এন্ড কমনওয়েলথ অফিস রিপোর্ট, ২০১১ এ বলা হয়েছে, “আমরা যে প্রশিক্ষণ দিই এবং আমরা যে সামর্থ গড়ে তোলার সহায়তা দিই তার সাথে মানবাধিকারের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীণভাবে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বাংলাদেশে একটি কর্মসূচী চালিয়ে গেছি, যেখানে আমরা বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)কে মানবাধিকার ও নৈতিক পদ্ধতিতে পুলিশের কাজ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। প্রশিক্ষণটি আধুনিক পুলিশী মানদণ্ডগুলোকে অনুসরণকারী ক্রিয়াগত বিচার-বিবেচনা ও প্রণালীগুলোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে মৌলিক মানবাধিকার, সাক্ষাৎকার ও তদন্তের কৌশলসমূহ এবং নৈতিক পদ্ধতিতে পুলিশের কাজ করার মতো ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাটালিয়নের দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর ওপর মনোনিবেশ করেছিলো।” **http://fcohrdreport.readandcomment.com/human-rights-in-safeguarding-britains-national-security/countering-terrorism/** (১ এপ্রিল ২০১১ এ দেখা)।

[২৬] “যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কেবল: মানবাধিকার লজ্ঘনের জন্য নিন্দিত বাংলাদেশী আধাসামরিক বাহিনীকে যুক্তরাজ্যেও পুলিশ প্রশিক্ষণ দিয়েছে”, দ্য গার্ডিয়ান, ২১ ডিসেম্বর ২০১০, **http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/206936** (১ এপ্রিল ২০১১ এ দেখা)।

বর্তমানে পুলিশ এবং সশস্ত্রবাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) থেকে সদস্যদের বেছে নিয়ে র‍্যাব গঠন করা হয় এবং তাঁরা র‍্যাব এ সেবার মেয়াদ পূর্ণ করার পর পুনরায় নিজ নিজ বাহিনীতে ফিরে যান। সৈনিকদের বেসামরিক আইনপ্রয়োগ করার কাজ দেয়া এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া একটি স্বতন্ত্র কাঠামো ও আচরণবিধি মেনে কাজ করার প্রত্যাশা করার কারণে এই পদ্ধতির বিস্তৃত সমালোচনা করা হয়েছে এবং এর পরিণামে পূর্বেই ধারণা করা যায় এমন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ঘটেছে। র‍্যাবের নিপীড়নমূলক অভ্যাসগুলো পুলিশের মত অন্যান্য বাহিনীর মধ্যেও প্রবেশ করবে বলেও সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে ক্রমাগত পাল্টাপাল্টি করার ফলে নিয়ম লঙ্ঘনের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তাদের ওপর নজর রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে।

র‍্যাবকে গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করার ফলে এটি প্রমাণিত যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য সরকারগুলো প্রকাশ্যে র‍্যাব এর সমালোচনা করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক (যদিও তারা ওয়াশিংটন ও লন্ডনে কূটনীতিক কেবল পাঠানোর সময় অনেক সরাসরি মত প্রকাশ করেছে)। উল্লিখিত সরকারগুলো এই অভিযোগ দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে যে, তারা একটি 'হত্যাকারী বাহিনী'কে সমর্থন দিচ্ছে কিন্তু তারা এই বিষয়কে সামান্যই স্বীকৃতি দিয়েছে যে, তারা র‍্যাবের অভ্যাসের উন্নতিসাধনের  জন্যে যে প্রশিক্ষণে সহায়তা দিয়েছে, সেগুলো তাদের খুবই কম প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। এটি অনস্বীকার্য যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেয়া ছাড়া মানবাধিকার প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তার পরিণামে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

কিছু কূটনীতিকবৃন্দ হিউম্যান রাইট্স ওয়াচকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি সুপারিশ করেছে , সেটি হলো- র‍্যাবকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে একটি পৃথক ক্ষুদ্রতর বাহিনী গঠন করা যা সন্ত্রাসবাদের বিরোধীতা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি দেবে। সৈনিকদের অংশগ্রহণছাড়া বিশেষভবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে এ ধরনের একটি বাহিনী গঠিত হবে। এ ধরনের একটি বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

***পধান সুপারিশসমূহ:***

- বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় র‍্যাব এর সম্পৃক্ততা বন্ধ করার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের উচিত সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন র‍্যাব দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় এবং পদমর্যাদা ব্যতিরেকে সকল দায়ী ব্যক্তির বিচার করা হয়।
- পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে র‍্যাব এর মানবাধিকার সংক্রান্ত রেকর্ডের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটলে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদের বিচার করা না হলে, বাংলাদেশ সরকারের উচিত

র‍্যাবকে ভেঙে দেয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মত অর্থদাতা দেশগুলোর উচিত এ ব্যাপারে সকল সাহার্য ও সহযোগিতা প্রত্যাহার করা। সরকারের উচিত র‍্যাবের স্থলে পুলিশের ভেতরে একটি নতুন বাহিনী গঠন করা অথবা স্বতন্ত্র কর্মপদ্ধতিসম্পন্ন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যা অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার সময় মানবাধিকারকে তার কেন্দ্রস্থলে স্থান দেবে।

- র‍্যাব বা তার স্থান গ্রহণকারী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান হতে হবে। এর কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সকল পদমর্যাদার সদস্যদের আর সশস্ত্রবাহিনী থেকে নেয়া যাবে না। কারণ সশস্ত্রবহিনীর সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণ পুলিশের থেকে আলাদা।
- ইতিমধ্যে র‍্যাবের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের (র‍্যাবের সর্বোচ্চ স্তরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গসহ) সনাক্ত করা এবং ঐ ব্যক্তিদের সংস্কারসাধিত র‍্যাবের বাইরে রাখা ও এদের বিচার করার জন্যে বাংলাদেশ সরকারকে একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করতে হবে। এছাড়াও এই কমিশনকে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং তার রূপায়ণের তত্ত্বাবধান করতে হবে যাতে র‍্যাবকে এমন একটি সংস্থায় রূপান্তরিত করা যায় যা আইনের গণ্ডিতে থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নিয়মাবলীর প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখিয়ে কাজ করবে।
- বাংলাদেশ সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন র‍্যাব বা পুলিশের হাতে আটককৃত যে কোন ব্যক্তি দ্রুত তার আইনজীবী, চিকিৎসক ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সরকারের উচিত বেসরকারী মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে সমস্ত র‍্যাব ইউনিট এবং তাদের বন্দীকক্ষে অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়া, যাতে নির্যাতনের অভ্যাস বন্ধ করা যায়।
- র‍্যাব যতদিন না হেফাজতে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার মতো অস্ত্রকে ব্যবহার করা থামাচ্ছে, স্বচ্ছতার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্যে দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করছে; ততদিন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বা সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উচিত এই বাহিনীর সঙ্গে কাজ করা থেকে বিরত থাকা।